জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' : মধ্যবিত্তের ট্রাজেডি

জহর সেনগুপ্ত

বাংলা কথাসাহিত্যেরর অন্তরালে একটা বড়োরকমের ট্র্যাজেডি দীর্ঘকাল ধরেই দৃঢ়মূল শিকড়ের মতো রয়ে গেছে, যে ট্র্যাজেডি আমাদের অনেকেরই ভালোভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও অপ্রিয় অবতারণায় দ্বিধায় অনেক সময় নীরবতাকেই শ্রেয় করেছি। কি সেই ট্রাজেডি? বলা যায় : বাংলা কথাসাহিত্যে এমন বেশ কয়েকজন লেখক আছেন, যাঁরা ছোটোগল্প রচনার ক্ষেত্রে শিল্পচূড়ার অসামান্য বিস্ময় স্পর্শ করেছেন — কিন্তু উপন্যাস রচনা করবার ক্ষেত্রে যাবতীয় শ্রম ঢেলে দিয়েও সফল ঔপন্যাসিকের বৃহৎ ব্যাপ্তি কোনোভাবেই কিন্তু জোড় করে নিতে পারেনি। এক অর্থে তাঁরা মহৎ ছোটোগল্পকার, সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যর্থ ঔপন্যাসিকও — সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। উদাহরণও দেওয়া যায়। যেমন সুবোধ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্র। গল্পের ব্যুৎপত্তি নির্মাণের দক্ষ কারিগর হওয়া সত্ত্বেও সুবোধ ঘোষ যখন 'শতকিয়া' -র মতো, নরেন্দ্রনাথ মিত্র যখন 'চেনামহল' - এর মতো কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্র যখন 'দিকভ্রান্ত' -র মতো উপন্যাস উপহার দেন— তখন বোঝা যায় : অন্তর্গত স্বধর্মে তাঁরা সম্পূর্ণতাই ছোটোগল্পকার, ঔপন্যাসিক নন। বরং উপন্যাস লিখে তাঁরা তাঁদের মহৎ প্রতিভার অপচয়ই করে গেছেন, জ্ঞানত বা অজ্ঞানত। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ছোটোগল্পকার হিসাবে তাঁর অসম্ভাব্য কারুকর্মের দ্বন্দ্বসন্ধি যে শিল্পসম্মত আবহের আলো অন্ধকারে উঠে যায় — ঔপন্যাসিক হিসাবে তিনি কিন্তু ততটা উচ্চে নেই, ততটা উচ্চে পৌঁছতেও পারেননি। স্বনামধন্য 'বারো ঘর এক উঠোন' সহ মোট তিপ্পান্নটি উপন্যাস লিখবার পরও ব্যর্থতার এই ট্র্যাজেডি আজকের পাঠকৃতিতে কিছুতেই আর অস্বীকার করা যায় না। 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। উপন্যাসটি পড়তে পড়তে মনে হয় : বারো রকমের গল্পকে তিনি যেন বর্ণিত আখ্যানের মধ্যে অদৃশ্য সুতো দিয়ে জুড়ে দিয়েছেন। মনে হয় : উপন্যাসের বর্ণিত আখ্যানের সর্বত্রই, তলে অবতলে গভীরে, ক্রমশই গল্পের সম্মোহনী ছায়া-প্রচ্ছয়া ঘনীভূত হচ্ছে। উপন্যাসের মধ্যে বারবার গল্পশিল্পের অতিরিক্ত এই সংক্রমণ, তার প্রভাব, তার আধিক্য, উপন্যাস রচনার কারুকৃতিকে অনেকাংশেই কিন্তু নষ্ট করে দিয়েছে। এ বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কি নিজে সচেতন ছিলেন না? বলা যায়, নিঃসন্দেহে ছিলেন। হয়ত এই সচেতনতা ছিল বলেই তিনি 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্যসংখ্যায় (১৩৮২-১৯৭৫) নিজস্ব সাহিত্যকৃতির পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন :

> ''কাজেই বুড়ো বয়সে এখন বুঝতে শিখেছি ছোটগল্প এক জিনিস, উপন্যাস আলাদা শিল্প। উপন্যাস লিখতে হলে ছোটগল্প লিখে হাত পাকাবার দরকার পড়ে না। বরং বেশি ছোটগল্প লিখতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে উপন্যাসের মধ্যে ছোটগল্পের মেজাজ এসে যাবার ভয় থাকে। আমার কিছু কিছু উপন্যাসে তাই হয়ে গেছে। এইজন্য অবশ্য আমি অনুতপ্ত নই। কারণ এ এক ধরনের উপন্যাস না হোক, উপন্যাসিকা তো বটে'' — দ্রষ্টব্য : আমার সাহিত্য জীবন : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর বাছাই গল্প; সম্পাদনা — সুব্রত রাহা অজয় দাশগুপ্ত।

এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তি 'বারো ঘর এক উঠোন' সম্পর্কেও প্রয়োগ সম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে লেখক জ্যোতিরিন্দ্র প্রথমে 'তারিণীর বাড়ি বদল' নামের একটি গল্প 'পূর্বাশা' পত্রিকায় রচনা করেন। পরবর্তীকালে এই গল্পটি থেকেই নির্মিত হয় 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের সামগ্রিক স্থাপত্য। ছোটোগল্পের বীজাভাস থেকে উপন্যাস রচনা করার দৃষ্টান্ত বাংলা কথা - সাহিত্যে খুব একটা কম নেই। তারাশঙ্কর করেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, দীপেন্দ্রনাথ করেছেন, করেছেন আরো অনেকেই। এই কাজ দোষনীয় নয়। কিন্তু দেখা দরকার : এই রূপান্তরীকরণের গূঢ় প্রয়োগগত শিল্পসাফল্য। এই সূত্রে 'তারিণীর বাড়ি বদল' গল্পটি পর্যবেক্ষণযোগ্য। এই গল্পে কেন্দ্রিয় চরিত্র তারিণী অর্থনৈতিক সংকটে বিপন্ন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্র। আট-দশটি সন্তানের পিতা ও প্রেসকর্মী। যুদ্ধে শেষের অনিশ্চিত সমাজব্যবস্থায় উচ্চমূল্য ও দুর্ভিক্ষের বাজারে হঠাৎই তার চাকরিটা চলে যায়। ফলে তারিণী তার সংসার ও সন্তানাদিসহ ঘোর বিপদের সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় কী করবে সে? কী করতে পারে সে? উদ্ভূত বিপর্যয় সামলাতে, এক দুপুরে সে, আর কোনো উপায়ান্তর না দেখে, অবশেষে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাসাবদলের অসহায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। আর তাই ভদ্র স্বচ্ছল সম্পন্ন পাড়ার দুটি কোঠাঘর ছেড়ে দিয়ে বেলেঘাটার দুস্তর এক অঞ্চলের দিকে গোটা সংসার নিয়ে ভেসে যাবার জন্য সে একটা ঠ্যালাগাড়ি ডেকে এনে তার ওপর মালপত্তর তুলতে শুরু করে। কিন্তু তাতেও কি আর রেহাই আছে? চারপাশে দ্রুত একের পর এক পাওনাদারেরা তাকে ঘিরে ধরে। এক অদ্ভুত রূঢ় বাস্তবের প্রতিনিধি হয়ে তারা যেন তারিণীর রক্তমাংস সম্মান সবকিছুই হিংস্রভাবে খুবলে নিতে থাকে। পাড়া প্রতিবেশীরা তারিণীর লাঞ্ছনা দৃশ্যটির পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকে; যেন তারা অবাক দর্শক। কেউ কোনো সাহায্যের জন্য এগিয়েও আসে না, কোনোরকম প্রতিবাদও করে না। সে এক অদ্ভুত সম্মানহারি কুৎসিত প্রতিযোগিতা যেন। আর্ত করুণ, অসহায় এরই মধ্যে শুনতে পায় এক অবাঙালি পাওনাদার তাকে বলছে— ''তুমি শালা চোট্টা আছো।'' তারিণী ভাবে : এবার বুঝি মধ্যবিত্ত প্রতিবেশীদের দিক থেকে পাল্টা কিছু একটা হবে। কিন্তু কই? কেউ তো কিছু বলছে না। বরং তারিণী মধ্যবিত্ত প্রতিবেশীদের মধ্য থেকে হালকা নানাবিধ চাপা গুঞ্জনের হুল ফোটানো কথাগুলো শুনতে পায়। কেউ বলছে — ঋণের দায়ে পালাচ্ছে। কেউ বলছে — আমরা কি আগে জানতাম কোনো কিছু। কেউ বলছে — আমাদের কাছে আগে এলে আমরা নিশ্চয়ই

সাহায্য করতাম এমনই সব নিষ্প্রাণ নির্বিবেক অকারণ সব বাক্যমালা। এরই মধ্যে মুদি এসে গেছে, গয়লানি এসে গেছে, কয়লাওয়ালাও এসে গেছে। কোথায় কোন্‌দিক পালাবে তারিণী? ব্যথিত চোখে সে দেখতে পায় — মুদি গয়লানি কয়লাওয়ালা তার মালপত্র ধরে টানাটানি করতে শুরু করে দিয়েচে, শুধু তাই নয় — জিনিসপত্তরগুলো অকারণে নষ্টও করে দিচ্ছে তারা। আর থাকতে না পেরে রুখে ওঠে তারিণী। তার গলায় তখন মধ্যবিত্তের অসহায়, আস্ফালন।— ''টাকা পাবে কোর্টে গিয়ে নালিশ করো, খবরদার মালপত্রের গায়ে হাত দিয়ো না, ফ্যামিলি ম্যান আমি, ভদ্রলোক...''। তারিণী ব্যবহৃত 'ভদ্রলোক' শব্দটা যেন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ হয়ে আবার তারিণীর দিকেই ফিরে অসে। মূলত এই শব্দটার মধ্যেই কিন্তু রয়ে গেছে অক্ষমতাজনিত নির্জীব আত্মপ্রলাপ কিংবা অসহায় আত্মরক্ষার দীন প্রয়াস। অবস্থা বেগতিক বুঝে ঠ্যালাওয়ালাও আর তখন গাড়ি টানতে চাইছে না। সহায় সম্বলহীন মধ্যবিত্ত সত্তার ভেতরকার বিপন্ন যন্ত্রণা নিয়ে তারিণী এবার কিছুটা যেন পাগলের মতো মালপত্তর বোঝাই গাড়িটা নিজেই টানতে শুরু করে। ঠ্যালা চলে। ঠ্যালাটাকে পেছন পেছন ঠেলতে ঠেলতে এগোয় অবরুদ্ধ বাকহীন স্ত্রী - সন্তানেরা। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারেনা তারা। একসময় ঠ্যালা উল্টে তারিণী সপরিবারে মারা যায়। গল্পটি এখানেই শেষ করেননি লেখক। তাই শেষে আমরা দেখি — তারিণীর পরিত্যক্ত ঘরে বাড়িওয়ালা আবার নতুন ভাড়াটে নিয়ে এসেছে। বন্ধ ঘরের তালা খুলতে খুলতে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করবার ভাড়াটাকে লম্বা টর্চ হাতে বাড়িওয়ালা আবার প্রবল উৎসাহে শোনাচ্ছে জল কল পায়খানা ও রান্নাঘরের ঐতিহাসিক বিবরণ। বলতে দ্বিধা নেই : 'তারিণীর বাড়ি বদল' গল্পটি প্রতীকী শিল্পময়তার দিক থেকে অসামান্য। গল্পের ছোটো পরিসরে লেখক যেভাবে মধ্যবিত্তের নিরুপায় অস্তিত্বের হাড়ভাঙা আর্তনাদ শুনিয়েছেন— সেই আর্তনাদকেই তিনি 'বারো ঘর এক উঠোন' -এর বৃহৎ বিস্তৃত পরিসরে আবার বাঙময় করেছেন। গল্পের তারিণী ক্রমশ হয়ে উঠেছে উপন্যাসের শিবনাথ। যদিও তারিণীর মতো সে আট দশটি সন্তানের পিতা নয়, তবুও তার অস্তিত্বের রূপকল্প তারিণী-সমান। উপন্যাসের শুরুতেই তাই আমরা শিবনাথের মধ্যে দিয়ে তারিণীর বাসা বদলের ঘটনাটি পুনরায় ফিরে আসতে দেখি। এখানেও দি গ্রেট হিমালয়ান ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার পর চাকরিচ্যুত ম্যানেজার শিবনাথ ও তার স্ত্রী সুরুচি ও মঞ্জুর হাত ধরে, উপায়হীন বাধ্যতায়, নাগরিক ভদ্র পরিমণ্ডল ছেড়ে বেলেঘাটার দিকে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। লক্ষ্য : ট্যাংরা-কুলিয়া বস্তির বারো ঘরের একটি ঘর। যথারীতি এখানেও পাওনাদারেরা উপস্থিত। যেমন ধোপা সুদর্শন এবং ঠিকে ঝি কামিনী। গল্পে অবস্থা - বিপর্যয়ের মধ্যে তারিণী নিজেকে 'ভদ্রলোক' বলে অক্ষম দাবি করেছিল। শিবনাথও প্রায় একই গলায় সুদর্শনকে মধ্যবিত্ত অভিমানের সঙ্গে ভাঙা অহং মিশিয়ে বলেছে :

> আহা এমন অসময়ে তুই এলি...কারোর পাওনা বাকি রেখে আমরা এখান থেকে যাব না, বুঝলি।...যাবি, বেলেঘাটা পর্যন্ত যেতে পারবি তোর গাধা চালিয়ে নিয়ে কাপড় আনতে? যাস তো তোকে দিয়েই সেখানে কাপড় ধোয়াব...

এই আমন্ত্রণের মধ্যে কিন্তু কোনো সদিচ্ছাবাচক জোর বা প্রত্যয় নেই — বরং রয়েছে মধ্যবিত্তের কৃত্রিম আত্মাভিমান, নিজেকে সর্বজন সমক্ষে একহভাবে বড়ো করে রাখবার এবং বড়ো করে দেখাবার আত্মপ্রহসন। উদ্ধৃত অংশের 'অসময়ে' শব্দটি এ-জন্যই যেনতা বহুবিধ তাৎপর্য বহন করেছে। তবু, তা সত্ত্বেও গল্পের স্বল্প পরিসরের ব্যঞ্জনায় লেখক যা করতে পেরেছেন অধিগত শিল্পের চূড়ান্ত কারুবিস্ময়ে— উপন্যাসের বৃহৎ পরিসর ব্যবহার করেও সেই সুগভীর সৃষ্টিচৈতন্যকে তিনি কি একইভাবে ধরে রাখতে পারছেন না। এ মন্তব্যের ভেতরে বিতর্ক আছে জেনেও একথা সম্ভবত আজ বলার দরকার যে গল্পের ক্ষণবিশ্বে অল্প সুযোগে দারিণী আমাদের যতখানি দিতে পেরেছে। উপন্যাসের কথনবিশ্বের ছড়ানো প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েও শিবনাথ কিন্তু আমাদের ততখানি দিতে পারেনি। তবু এই ব্যর্থতা সত্ত্বেও, 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসটিকে বাদ দিয়ে বাংলা উপন্যাসের আলোচনা কিন্তু সম্ভব নয়। তার কারণ? তার কারণ একটাই — এই উপন্যাসের বিষয়, অন্তর্গভীর বিষয়। সেই অন্তর্গভীর বিষয়টি কি? বলা যায় : মধ্যবিত্ত শ্রেণিদর্শন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিবিশ্লেষণ। সমকালীন বাস্তবের নিদারুণ নির্মোক ছিঁড়ে অন্তর্গত মনোবীজ ভাঙনের এই আর্তনাদ, হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়া জীবনের এই চাপা প্রহসন, নষ্টভ্রষ্ট বিচ্ছিন্ন অতি বিচ্ছিন্ন সময়ের এই পঙ্কিল স্রোত আর ভ্রান্ত কুহক কুয়াশার কাছে শুধুমাত্র আত্মরক্ষার নামে এই অপচয়িত আত্মসমর্পণ — উপন্যাসের সামগ্রিক ব্যর্থতাকে অনেকখানি চাপা এবং ঢাকা দিয়ে রাখে বলেই অন্তত সমাজ বিশ্লেষণমূলক বক্র মনস্তত্ত্বের উপন্যাস হিসাবে 'বারো ঘর এক উঠোন' নিভৃত আলোচনার একটা নীরব দাবি সব সময়েই রাখে। আসলে লেখক জ্যোতিরিন্দ্র চারদিকেই তখন ছিন্নমূল জীবনস্রোতের বিশ্বাসহীন অবস্থান তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছেন, শুধু দেখছেন বলা ভুল, অন্তর্ভেদী চৈতন্য দিয়ে খননও করেছেন। এই জন্যই 'কালপুরুষ' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকার প্রদানকালে যখন তাঁকে বলা হয় 'আপনি অবক্ষয়ের সার্থক কথাশিল্পী' তখন তিনিও এই প্রদত্ত অভিধা প্রায় মেনে নিয়ে স্পষ্টতই স্বীকার করেছেন :

> এটা তো সত্যি কথাই। আমি তো মধ্যবিত্ত মানুষ, কাজেই এই জীবনের সঙ্গে যতটা পরিচয় অন্য জীবনের সঙ্গে আমার ততটা পরিচয় নেই। কাজেই এখানে আমি যতটা দেখতে পাই শুনতে পাই ততটা অন্য জীবনে নয়। সুতরাং এখানে আমার কলম বেশি করে যাবে এটাই তো স্বাভাবিক। আর এটা তো মধ্যবিত্ত জীবন। ঐ যে শিবনাথও তার স্ত্রী এরা তো মধবিত্ত মানুষ। মধ্যবিত্ত মানুষের চরিত্র বোধহয় শিবনাথ চরিত্রেই সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে। কাজেই মধ্যবিত্ত জীবন নিয়েই আমি সবচেয়ে বেশি লিখেছি। —দ্রষ্টব্য : অনুষ্টুপ,

সবচেয়ে বেশি' লেখাটা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা অভিক্ষেপসঞ্চারী প্রবণতা। এই প্রবণতা লক্ষ্য করেই, attitude towards life, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' গ্রন্থের 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাস' প্রবন্ধে বিশিষ্ট সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন —''মানিকবাবুর মন্ত্রশিষ্য জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।'' তার সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও স্পষ্ট বলেছিলেন —''জীবনের দিকেই ...তাকানোর ব্যাপারটাতেই তাঁর ব্যত্যয় আছে! আছে বলেই তাঁর বিবর্তন, বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুতে পারল না।'' সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য এখানে অত্যন্ত পরিষ্কার। তাঁর মতে 'বারো ঘর এক উঠোন' এর মধ্যেই তার অবসান ঘটে গেছে। এর পর তাঁর আর বক্তব্যগত কোনো গতি নেই— বরং বক্তব্যের শূন্যতাই তাঁকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। ঠিকই বলেছেন তিনি। তবে উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ-কথা সত্য, ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে কিন্তু নয়। আসলে 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের ভেতর লেখক সর্বতোভাবেই একটা কাজ ক্রমান্বয়ে করেছেন। তা হলো অবক্ষয়ের কর্দমে অন্বয় ভাঙা মধ্যবিত্তের যথাসম্ভব নিকটতর বীক্ষণ। এই বীক্ষণের লেখক প্রথমে নিজেই বাইরে থেকে 'প্যান - অপ্টিকন' -এর ভূমিকা পালন করেছেন। তারপর উপন্যাসের আখ্যান চলমান হলে তিনি নিজেকে এই অতিগূঢ় পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে 'প্যান - অপ্টিকনে'র দায়িত্ব শিবনাথের ওপরে সম্পূর্ণই ছেড়ে দিলেন। এক্ষেত্রে প্যান-অপ্টিকন কে, কী তার কাজ বা ভূমিকা, এ বিষয়েও দু একটি কথা বলা দরকার। আগে, একটা সময়, কয়েদিদের শাস্তি দেবার জন্য, কালো অন্ধকার কুঠরিতে বন্দি করে রাখা হতো। সেই কুঠরির মধ্যিখানে উঁচু একটা টাওয়ার (যেমন গহন গভীর ফরেস্টে জীবজন্তু দেখবার জন্য থাকে আর কী) বসানো। এই উঁচু টাওয়ারে বসে বন্দিদের ওপর আলো ফেলে ফেলে তাদের সমস্তরকম কাজকর্ম গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতো আর কেউ নয় — প্যান অপ্টিকন। এভাবেই অহর্নিশ তীক্ষ্ণ প্রহরার মাধ্যমে প্যান অপ্টিকনের কাজই ছিল কয়েদিদের কে কোথায় কী করেছে তার প্রাত্যহিক খতিয়ান রাখা। 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে শিবনাথও অদ্ভুতভাবে প্রথম থেকে শেষাবধি এই কাজটা করে গেছে। কিন্তু প্যান অপ্টিকনের একটা মুশকিলও আছে। উঁচু টাওয়ারে বসে আলো ঘুরিয়ে সে সবাইকে ক্রমাগত লক্ষ্য করে, শুধু নিজেকে ছাড়া। এক্ষেত্রে নিজেকে দেখার কথাই তার শুধু মনে থাকে না। শিবনাথের সমস্যাও মুখ্যত এইখানে। ট্যাংরা কুলিয়া বস্তিতে সে দিনের বেলায়ও প্যান-অপ্টিকন, আবার রাতের বেলায়ও প্যান-অপ্টিকন। দিনের বেলায় সুরুচি স্কুলে চলে যাবার পর সে একা একা ঘুরতে ঘুরতে কখনো বনমালীর মুদির দোকানে, কখনো রমেশের চায়ের দোকানে, কখনো পাঁচুর সেলুনে, কখনো শেখর ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে, আার কখনো বা পারিজাতের সুশোভিত ড্রইংরুমে ঢুকে ভ্রাম্যমান প্যান-অপ্টিকনের ভূমিকা পালন করেছে। আর রাতের বেলা? স্কুল থেকে ফিরে ক্লান্ত ও নিস্তেজ সুরুচি শুয়ে পড়বার পর যখন অন্য এগারো ঘরের দরজা বন্ধ ও আলো নিভে গেছে— বস্তিঘরের কোথাও চলছে মৃদু ফিসফিস আবার কোথাও শোনা যাচ্ছে মাতালের অসংলগ্ন প্রলাপ— শিবনাথ তখন জানলার অন্ধকারে দাঁড়ানো নীরব নিঃশব্দ এক কৌতূহলী প্যান-অপ্টিকন। কান তার খাড়া। ঘ্রাণ তার মারাত্মক। চোখ তার বস্তির বন্ধ দরজা ভেদ করে সরু টর্চের আলো ঢুকে পড়েছে একেবারে সকলের গোপন অন্দরমহলে। এভাবেই নীরব নিঃশব্দ অসম্ভব কৌতূহলী প্যান অপ্টিকন হয়ে কখনো সে দেখেছে বীথির হঠাৎ অনাবৃত স্তন, আবার কখনো সে শুনেছে স্বামী লাঞ্ছিত কিরণের গুমরে ওঠার চকিত আর্তনাদ। উপন্যাসে মধ্যবিত্ত শিবনাথের এই দু-ধরনের প্যান-অপ্টিকন রূপে আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে লেখক, জ্যোতিরিন্দ্রের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের একটা প্রচ্ছন্ন ভ্রুক্ষেপ কিন্তু রয়ে গেছে। আর তাই রাস্তায়, খালপাড়ে, কিংবা রেললাইনের পাশে ভ্রাম্যমান প্যান-অপ্টিকন শিবনাথকে দেখতে দেখতে আমাদের মনে পড়ে যায় শ্রীমতী পারুল নন্দীর স্মৃতিভাষ্য:

> সকালে বিকালে একটা ঘুরতে যেতেন। রাস্তায় মানুষজনের সঙ্গে, সেইসব মানুষ পরিচিত হলেও দীর্ঘক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলতে পছন্দ করতেন না।... শিল্পের জন্যই মানুষটি একলা হয়ে গিয়েছিলেন। —আমার স্বামী : দ্রষ্টব্য স্নিগ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী' : মে-২০০৮, জীবনী গ্রন্থমালা ৫৫, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

শিবনাথ চরিত্রও কি ঠিক এমনটা নয়? ঘুরতে ঘুরতে বনমালীর দোকানে সে গেছে, সেখানে কে, গুপ্তর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাও বলেছে, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ নয়। বরং মাঝে মাঝেই অধৈর্য হয়ে সে কে. গুপ্তর হাত ছাড়িয়ে আবার অন্যত্র গমন করেছে। রমেশের বা পাঁচুর দোকানের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। লেখক এই সূত্রে লিখেছেন — ''হাঁটতে হাঁটতে শিবনাথ বেশ দূরে চলে যায়।'' কতদূর? হাড়ের কল চামড়ার কল ছাড়িয়ে প্রস্তুতিলগ্নের সল্টলেক পর্যন্ত। এই সময় রাস্তায় বলাই বা বিধু মাস্টারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে শিবনাথ বাক্যালাপ করেছে ঠিক কথা — তবে সে সময় সে কিছুটা হলেও অস্থির, দায়সারা, অন্যমনস্ক। বোঝা যায় : চলন্ত এই শিবনাথের মধ্যে লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নিজেও আছেন। শিবনাথের মধ্যে তাঁর এইভাবে থাকাটা আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে যায় এই উপনাসের বিশেষ দুটি ঘটনায়। ঘটনা দুটি বলা দরকার। প্রথমেই ৮ পরিচ্ছেদের ঘটনাটি স্মরণ করা যেতে পারে। শিবনাথ রমেশের দোকান থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ অকারণ এদিক- সেদিক করাবার পর ময়লা খাল ও রেললাইন পিছনে ফেলে একসময় একটা নির্জন ঝোপের কাছে এসে ঝোপের আড়ালে রুণু ও ময়নার মৃদুমন্দ কলহাস্য শুনে থমকে দাঁড়ায়। তারপর ওদের অগোচরে লুকিয়ে লুকিয়ে উভয়ের কথাবার্তা প্রেমালাপও শোনে। এমন কি যে অন্ধকারে ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও সিগারেট পর্যন্ত ধরায় না — পাছে ওরা

আগুন দেখে শিবনাথের গোপন অবস্থান জেনে যায়। ঠিক এমনই কাজ শিবনাথকে আমরা আরো তিনবার করতে দেখি এই উপন্যাসের ১০,১১ এবং ১৬ পরিচ্ছেদে। ১৯ পরিচ্ছেদে শিবনাথ আবার গেছে সেই নির্জন ঝোপের কাছে, যেখানে রুণু ও ময়না একইভাবে ঘনিষ্ঠ কথোপকথনে রত। লেখক লিখেছেন —''মাঠ পার হয়ে শিবনাথ কপিক্ষেতের ধারে চলে এলে। ঝোপটা সে চিনতে পারল। শব্দ না হয় এমনভাবে পা ফেলে আস্তে আস্তে সে ঝোপের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। অনুমান তার মিথ্যা হয় না। একটু সময় কান পেতে রেখে শিবনাথ দুজনের কথা শুনতে পেল।'' এই বর্ণনাই বলে দিচ্ছে শিবনাথের ভেতর কৌতূহলী স্বভাব কতখানি উদগ্র ছিল। ১৬ পরিচ্ছেদেও শিবনাথ এই ভূমিকায় অবতীর্ণ। ডোমপাড়ায় আগুন লেগেছে। বারো ঘরের সবাই বাইরে এসে দেখছে। সকলের থেকে একটু আলাদা হয়ে বস্তির কমলা ও বীথি আগুন দেখতে দেখতে মৃদুস্বরে কথা বলছিল। শিবনাথ গাছের আড়াল থেকে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে ওদের কথাবার্তা শুনতে। এখানেও ধরা পড়ে যাবার ভয়ে সে যেমন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সিগারেট ধরায়নি, তেমনই পায়ে মশা কামড়াচ্ছে বুঝেও মশা মারবার চেষ্টা করেনি। কারণ সেক্ষেত্রে শব্দ হবে। লেখক লিখেছেন — ''ওরা ঠিক আগুন নিয়ে গল্প করছে কিনা জানবার ইচ্ছাটাই যেন শিবনাথের প্রবল।'' নীরব নিঃশব্দ প্রগাঢ় কৌতুহলী এইই প্যান—অপ্টিকনের প্রবণতা বা মানসিকতা দ্রুত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর স্বভাবধর্ম সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি সবিশেষ মন্তব্য। তিনি 'নীল রাত্রি ও বনের রাজা' নামক এক গদ্যে (দেশ সাহিত্যসংখ্যা : ১৩৭৬) একদা বলেছিলেন :

> শুনেছি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর একটা স্বভাব আছে, মাঝে মাঝে একা ঘুরে বেড়ানো। কখনো কোনো অপরিচিত পুরুষ বা নারী বা দম্পতির কোনো বৈশিষ্ট্য তাঁর চোখে লাগলে তিনি নিজের খেয়ালে তাদের অজান্তে তাদের পিছু পিছু অনেকক্ষণ অনুসরণ করেন?... সেইসব নারীপুরুষ জানতেও পারে না, একজন তীক্ষ্ণ ধী-মনস্বী লেখক তাদের এই ধূলিকাদায় ভরা ট্রামবাসের ভিড়ের রাস্তা থেকে সশরীরে তুলে নিয়ে প্রতিষ্ঠিত করে দিচ্ছেন সাহিত্যের অমরলোকে।

সুতরাং শিবনাথের বেশ খানিকট অংশই যে লেখক জ্যোতিরিন্দ্রের নিজস্ব প্রতিরূপ, নিজস্ব স্বভাবধর্মের প্রতিনিধি— এ বিষয়ে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই। আসলে এভাবেই নিজের সৃষ্ট চরিত্রের ওপর লেখকদের একটা ছায়াপাত অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু ঘটে যায়। তার মানে কিন্তু এই নয় যে শিবনাথের পুরোটাই লেখক জ্যোতিরিন্দ্র। আসলে লেখক নিজের যখন 'প্যান-অপ্টিকন' এর ভূমিকা থেকে আস্তে আস্তে প্রত্যাহার করে নিতে শুরু করলেন, তখন উপন্যাসের চলন্ত আখ্যানে প্যান - অপ্টিকনের সে দায়িত্বটা শিবনাথের সমর্পণ করার কালে তিনি নিজেও কিন্তু কিছুটা হলেও শিবনাথের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। হয়তো এইজন্যই শিবনাথের বেশ কয়েকটি স্বভাব প্রবণতায় লেখক জ্যোতিরিন্দ্রের নিজস্ব কিছু ছাপ পড়ে গেছে। যেমনটা একদা শ্রীকান্ত চরিত্রের ওপর শরৎচন্দ্রের কিংবা অপু চরিত্রের ওপর বিভূতিভূষণের পড়েছিল। তবে একথা সর্বাগ্রে বলা দরকার : মধ্যবিত্ত চেতনা ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনেক গল্প অনেক উপন্যাসই লেখা হয়েছে সত্য কথা, কিন্তু 'বারো ঘর এক উঠোন' এর ভাবনাকল্প সে-সব স-জন থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে প্যান - অপ্টিকন রূপে শিবনাথের আত্মপ্রকাশ, অবস্থান এবং আত্মসংশ্লেষের গুহ্য কারণে। মধ্যবিত্ত শ্রেণিচরিত্রকে এইভাবে প্যান-অপ্টিকন রূপে প্রয়োগ করার মধ্যে দিয়ে লেখক জ্যোতিরিন্দ্র কিন্তু আখ্যানের অনেক দুর্বলতাকেই ঢাকা দিতে সফল হয়েছেন। আসলে এভাবেই তিনি শিবনাথকে আশ্রয় করে দেখাতে চেয়েছেন দুর্জ্ঞেয় সময়ের সর্বনাশা অবক্ষয়। সমকালের বিকৃত ও বিভ্রান্ত স্বরূপের মধ্যেই ঢুকতে চেয়েছিলেন তিনি। দেখতে চেয়েছিলেন : সময়ের ভেতর মানুষের পতনের শব্দ কতখানি। দেখতে চেয়েছিলেন : সমাজের ভেতর মানুষের আত্মিকভাবে মৃত্যু হয় কতবার। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে এই মানসিক মৃত্যু ও পতনের শব্দ নানাভাবেই এসেছে। এভাবেই তিনি সময়ের দিকে ফিরেছেন, জীবনের দিকে ফিরেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় বিষয়ভাবনাকে কখনোই মধ্যবিত্তের শ্রেণিসংস্রব ও শ্রেণিসংরাগ থেকে একবারের জন্যও বিচ্ছিন্ন করেননি।

দুই

একটা সময়, বিশেষত বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময় সংক্রমণকাল থেকেই, বাংলা কথাসাহিত্যের অত্যন্ত কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল : মধ্যবিত্ত মনোবিশ্লেষণ। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ এমন এক নিষ্ঠুর ও প্রতারক বস্তুবিশ্বের গর্ভগৃহে আমাদের পৌঁছে দিয়েছিল, যেখানে প্রতিদিনের বাস্তবে মানুষের পক্ষে নিজস্ব মনোবিশ্বের স্বধর্ম রক্ষা করাই ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সময়ের পঙ্কিল স্রোতে সে এক অদ্ভুত পতনবিশ্ব। নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধগুলো তখন দ্রুত বন্ধ্যাস্বরূপ ধারণ করেছে। ন্যায় ও অন্যায়, পাপ ও পুণ্য, ধর্ম ও অধর্ম, শুভ ও অশুভ, ভালো ও মন্দ ইত্যাদির মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। একটার পর একটা সংকটে আক্রান্ত জীবনও তখন তার যাবতীয় কার্যকরী ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে নিছক এক প্রহসন ও বিভ্রমের পতনচিহ্ন হয়ে উঠেছে। চারিদিকে শুধু অবক্ষয় আর অবক্ষয়। চারিদিকে শুধু আপোষপ্রবণতা আর আপোষপ্রবণতা। 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মূলত এই অবক্ষয়জাত পতনচিহ্নের আপোষপ্রবণতাকেই ধারণ করলেন। সেই সূত্রেই এই উপন্যাসে আমরা দেখলাম — বিবেকবিভ্রম, চৈতন্যবিভ্রম, আদর্শবিভ্রম। কোথা থেকে এলো এই বিভ্রম? কীভাবে দেখা দিলো এই

বিভ্রম? এক্ষেত্রে নৈতিক অবনতির পেছনের কারণগুলো একবার পর্যবেক্ষণ করা দরকার :

প্রথমত: প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উৎকেন্দ্রিক উন্মাদনায় গোটা বিশ্ব-অর্থনীতি তলে তলে প্রায় ভেঙে পড়েছিল। একদিকে ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা, অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি— এই দুইয়ের মিশ্রিত প্রভাবে নাগরিক মানুষের জীবনে এক ধরনের বৃহৎ সংকট নেমে এসেছিল। সাধারণত নাগরিক জীবনে বসবাসকারী প্রত্যেকটি মানুষই চায় : সামাজিক আভিজাত্য। এই আপাত সামাজিক আভিজাত্যের আমোদ-প্রমোদ-জীবনসংরক্ষণ স্থায়ী অর্ধনীতি ব্যবস্থা ছাড়া কোনোমতেই সম্ভবপর নয়। এই বিপর্যস্ত বিশ্ব পরিস্থিতিতে নাগরিক মানুষজন স্বভাবতই ভেতরে - ভেতরে অস্থির ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। আর তাই সামাজিক আভিজাত্যের বাইরের খোলসটা কীভাবে যাবতীয় বিপন্নতার মধ্যেও ওপর-ওপর বজায় রাখা যায়— মূলত এই উদ্বেগী মানসিক ভাবনা নগরকেন্দ্রিক কৃত্রিম জীবন-প্রণালীর মধ্যে ক্রমাগত বড়ো প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অর্থনৈতিক সংকটে ভাঙতে থাকে ব্যক্তিগত মানবসত্তা।

দ্বিতীয়ত: ভেঙে পড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, সেই সময়, সেই চলমান সময়বাস্তবে, সবচেয়ে বেশি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ হয়ে উঠলো চাকরি। এর ফলে চাকরিপ্রার্থী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলো। আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিভূমি এইভাবে নড়বড়ে হয়ে যেতেই একটা বড়োরকমের মধ্যবিত্ত অংশের কাছে যেমন-তেন প্রকারে নাগরিক অস্তিত্বরক্ষা করাটাই জীবনের আসল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ালো। ফলে, খুব দ্রুত, তাদের কাছে সুনীতি ও দুর্নীতির মধ্যে আর কোনো পার্থক্য রইলো না। বিভ্রমের অদ্ভুত বাস্তবতায় ক্রমশই মূল্যবোধের অবক্ষয় শুরু হয়ে গেলো। সবচেয়ে বড়ো কথা — এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিক মূল্যবোধহীন মানসিকতা সমাজ-জীবনের সর্বস্তরে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়লো।

তৃতীয়: ভেঙে পড়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, সেই সময়, সেই চলমান সময় বাস্তবে, শুধু চাকরিপ্রার্থী উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই স্বপ্নভঙ্গজনিত হতাশায় আক্রান্ত হলো না— সেই সঙ্গে সঙ্গে চাকরিরত স্বচ্ছল মধ্যবিত্তদের সামনেও হঠাৎ করে অনিশ্চয় বিপদ ঘনিয়ে উঠলো। অর্থনৈতিক মন্দার কারণে একের পর এক মার্চেন্ট কোম্পানী বন্ধ হয়ে গেল, একের পর এক ব্যাঙ্কের ভরাডুবি ঘটে গেল। ফলে যারা নিরুদ্বিগ্নে চাকরি করছিল — হঠাৎই চাকরি চলে গেল তাদের। সামাজিক আভিজাত্যের নাগরিক উচ্চতা থেকে নীচে নেমে আসতে বাধ্য হলো তারা। চাকরি না পাওয়ার জীবন একরকম, কিন্তু চাকরি পেয়েও হারানো আরও ভয়ংকর। ফলত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণি একদিকে যেমন এ-হেন আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়কে মন থেকে একেবারে নেমে নিতে পারছিল না, অন্যদিকে তেমনই তৈরি করা আপাত উচ্চতার খোলশটাকে ছিঁড়ে অন্য সকলের মাঝে নেমে এসে তেমনভাবে জীবন কাটাতেও পারছিল না। তাছাড়া এতদিন ধরে চাকরি করার সুবাদে তারা যেভাবে নিজেদের একটা আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন সমাজের অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল, সেই বিচ্ছিন্নতা বোধ থেকেও কিন্তু তারা। কিছুতেই নিজেদের মুক্ত করতে পারছিল না। সুতরাং, এ-হেন, বিপজ্জনক প্রেক্ষিতে, একেবারে ডুবন্ত মানুষ হিসাবে মূল্যবোধের অবক্ষয় ছাড়া প্রাণপণে আঁকড়ে ধরবার মতো তাদের আর কিছুই ছিল না।

চতুর্থত: এতদিন পর্যন্ত মানুষ একান্নবর্তী পরিবারের অংশ ও অংশীদার হয়ে সহযোগে জীবন অতিবাহিত করেছে। একান্নবর্তী পরিবারের একসঙ্গে বসবাস করবার কতগুলি সদর্থক দিক ছিল। সেখানে কেউ একা নয়, একক নয়, খণ্ডও নয়? সকলের জন্যে সকলে— এই ঐক্যবদ্ধ জীবনমন্ত্রই ছিল একান্নবর্তী পরিবারে সেই ভাঙন দেখা দিলো, মানুষেরও মধ্যেও কারো সঙ্গে কারো আর আত্মিক সংযোগ বা সম-অনুভবী সম্পর্ক রইলো না। মনোবিজ্ঞানী Trigant Burrow এই সম্পর্কহীন যান্ত্রিক দূরত্ব নির্দেশ করে তাই বলেছিলেন — "Today human felations are through out superficia and not fundamental. They are psycho-social, not biological." আসলে একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা ভেঙে যেতেই প্রাণ পর্যন্ত প্রসারিত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল, শিকড় পর্যন্ত প্রোথিত অনুভব লুপ্ত হয়ে গেল এবং অন্তর্গত চৈতন্যের গভীরতর 'লোকেকাত্বতা বোধ' (...শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ Community feeling বলতে যে বোধের কথা একদা উল্লেখ করেছিলেন...) প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল। মানবিক সম্পর্কের এই ক্রমহ্রাসমান দূরত্ববোধ পরিব্যাপ্ত সমাজ সংবদ্ধতার ক্ষেত্রে একটা বড়ো রকমের অভিশাপ হয়ে উঠলো। খুব স্বাভাবিকভাবেই এক অন্নের একান্নবর্তী পরিবারগুলো বারো ঘরের বারো দিকে বারো সারিতে ভাগ হয়ে গেলো বলেই হারমোনিয়ামের বারো রিডের সম্মিলিত ঐকতান মানুষের প্রাত্যহিক জীবন থেকে একেবারে যেন হারিয়ে গেলো।

পঞ্চমত: নাগরিক জীবনের অতিরিক্ত যান্ত্রিক প্রবণতার মধ্যে থাকতে থাকতে মানুষ তার যান্ত্রিক জীবনযাত্রার মধ্যে এমনভাবে বদ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, নিজেকে ছাড়া সে আর চারপাশের অন্য কারো সম্পর্কেই বিন্দুমাত্র ভাবিত ও আগ্রহী ছিল না। এর ফলে প্রাত্যহিক সমাজবাস্তবতায় এমন এক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষকে দেখা গেল—যারা মূলত নির্লিপ্ত, উদাসীন, নির্বিবেক এবং হৃদয়হীন। নিজেদের মন ও

বিবেকটাকে এইসব মধ্যবিত্তরা আসলে টাকার কাছেই নির্বিকারচিত্তে সমর্পণ করে দিয়েছিল। ফলে খুব দ্রুত সামাজিক স্পম্পর্ক ও মানবিক সম্পর্ক সব অর্থেই যেন যা বিনিময়যোগ্য আর্থিক সম্পর্কে পরিণত হয়ে গেলো। নিজেদের লোভ ও স্বার্থই হয়ে উঠলো জীবনের একমাত্র আরাধ্য। সবচেয়ে বড়ো কথা : নাগরিক মর্যাদার মানদণ্ড উঁচু রাখতে এইসব মধ্যবিত্তরা একদিকে যেমন মেট্রোপলিটন ভেদপ্রবণতার শিকার হতে দ্বিধা করলো না, অন্যদিকে তেমনই যে-কোনো অবস্থাতে আপোষ প্রবণতাকেই আপন উত্থান-পতনের স্বধর্ম করে তুললো।

'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে এই মূল্যবোধহীন আপোষ প্রবণতারই ছাপ পড়েছে নানাভাবে, নানাদিক থেকে। এই মূল্যবোধহীন আপোষ প্রবণতার মূল কারণ কী? ভাঙা অর্থনীতি। সময় সংকট এবং সমাজ সংকটের ঠিক এই খানটিতেই লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মূলত গভীর অভিনিবেশী দৃষ্টি রেখেছেন। এ সেই সময়, যখন মূল্যবোধ ভাঙছে। খুব দ্রুত ভাঙছে। চলমান সমকালের এই প্রেক্ষিতে শিবনাথ নিজেও যেমন চাকরি হারানো এক ডুবন্ত মানুষ, তেমনই বস্তির অন্য সব মানুষগুলোও একইরকম ডুবন্ত মানুষ। সর্বত্রই এক অদ্ভুত ধরনের ক্রাইসিস ফ্রাস্টেশন। এই ক্রাইসি ফ্রাস্টেশনের সুযোগ নিয়ে পাঁচু ভাদুড়ী তার সেলুনের ওপর ম্যাসাজ ক্লিনিক (আসলে দেহ ব্যবসাকেন্দ্র) খুলে বসেছে আর সেই ম্যাসাজ ক্লিনিকের নোংরা পাঁকে বিধু মাস্টার তার দুই মেয়ে মমতা ও সাধনাকে রোজগারের আশায় নির্বিকারচিত্তে সমর্পণ করে বসে আছে। একি মূল্যবোধের অবক্ষয় নয়? এই ক্রাইসিস ফ্র্যাস্টেশনের সুযোগ নিয়ে রমেশ তার ভাই ক্ষিতীশকে দিয়ে চা-দোকান তথা রেস্টরেন্ট খুলে নানারকম চোরাকারবার চালু করে দিয়েছে আর সেই চোরাকারবারের অধৈয্য পারকর্মে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা একটু করে জড়িয়ে গেছে মার্চেন্ট অফিসের উঁচু চাকরি হারানো কে. গুপ্তর একদা লরেটো স্কুল পড়া কন্যা বেবি। সংসার ও বাস্তবের নিষ্ঠুর প্রয়োজনের কাছেই নিজেকে বলি দিতে সে বাধ্য হয়েছে। একি মূল্যবোধের অপচয় নয়? এই ক্রাইসিস ফ্রাস্টেশনের সুযোগ নিয়ে ফিল্ম মেকার চারু রায় বস্তিজীবনে ঢুকে অমল চাকলাদার ও তার স্ত্রী কিরণের নকল হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে চরম বিপদের দিনে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহযোগিতা করে। বিনিময়ে চলন্ত রিক্সায় চারু রায় অমলের সামনেই কিরণের কোলে অশ্লীল হাত রাখে। এ কি মূল্যবোধের অবক্ষয় নয়? এই ক্রাইসিস ফ্র্যাস্টেশনের সুযোগ নিয়ে মধুলোভী মৌমাছির মতো লম্পট রোগাক্রান্ত সুবীর ঘোষ প্রায় নিয়মিত শেখর ডাক্তারের বাড়ি এসে উপস্থিত হয়। লক্ষ্য তার সুনীতি। শেখর ডাক্তারের স্ত্রী ও সুনীতির মা প্রভাতকণা সব বুঝেও সুবীরকে প্রশ্রয় ও প্ররোচনা দেয়। অবশেষে সুনীতিকে নিয়ে একরাতে সুবীর পালায়। এ কি মূল্যবোদের অবক্ষয় নয়? এই ক্রাইসিস ফ্রাস্টেশনের সুযোগ নিয়ে বারো ঘর বস্তির কর্তা পারিজাত সমাজসেবার নামে শুধুমাত্র বস্তির মেয়ে - বউদের জন্য গেঞ্জির কারখানা খুলে বসে। সেই গেঞ্জির কারখানায় বস্তির মেয়ে বউদের আনার জন্য সে কখনো ব্যবহার করে রমেশকে, কখনো বা রমেশ খুন হয় যাবার পর ময়নার বাবা অভাবগ্রস্ত বলাইকে। এমনকি রুণুকে যখন পারিজাত গাড়ি চাপা দেয়, তখন রুণুর সঙ্গেই ছিল ময়না। রুণুকে এইবাবে সরিয়ে দেবার অর্থ কিশোরি ময়নাকেই দখল করবার সুপ্ত ইচ্ছে— এমনটাও কিন্তু ঘটনাক্রমে ভাবা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পথের কাঁটা ছিল একমাত্র রুণু। সুতরাং তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো সুচতুর কৌশলে। একি মূল্যবেধের অবক্ষয় নয়? নৈরাশ্যপীড়িত কে. গুপ্ত এইসব মূলবোধহীন অবক্ষয় ও অপচয়ের মধ্যেই কিছুটা যেন যাত্রাপালার 'বিবেক' চরিত্রের মতো ক্রমাগত মদ্যপান করতে করতে আর্তনাদ করেছে—'give beauty back, beauty, beauty, beauty,' কিন্তু সমাহিত সৌন্দর্য কোথায়? অফুরন্ত অনিঃশেষ সৌন্দর্যভান্ডারই বা কোথায়? নষ্ট ভ্রষ্ট বাস্তবের সবটাই তো নোংরা, কুৎসিত, বিবর্ণ ও নিরানন্দ। তারই বলি হচ্ছে মানুষ; তারই শিকার হচ্ছে মানুষ। ওই ভয়াবহ কর্মাদাক্ত বাস্তবতায় আবদ্ধ প্রায় প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই হয়তো এখনো কিঞ্চিৎ সৌন্দর্যতৃষ্ণা সুপ্ত হয়ে আছে, কিন্তু চলমান সমকালের নৈতিক পতনবিশ্ব বারবারই তীব্র ও নিষ্ঠুরভাবে মানুষের এই সৌন্দর্যতৃষ্ণাকেই বারবার প্রতিহত ও প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ মানুষের সৌন্দর্যতৃষ্ণাকে পূর্ণ করবার মতো শক্তি এবং শুশ্রুষা করবার মতো সামর্থ্য তার আর নেই। ফলে একদিকে বারো ঘরের অবরুদ্ধ যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার মধ্যেই একের পর এক সৌন্দর্যতৃষ্ণার মৃত্যুও ঘটে যাচ্ছে দ্রুত। শিবনাথকে আমরা এ-সবের মধ্যেই দাঁড়াতে দেখি, ঢুকতে দেখি, ঘুরতে দেখি— কিন্তু একবারের জন্যও তাকে আমরা বার হয়ে আসতে দেখি না। অথচ তার মধ্যে একটা অতৃপ্ত সৌন্দর্যবোধ এবং সৌন্দর্যবোধ সম্পৃক্ত স্বপ্নবোধও ছিল। উপনাসের প্রথমদিকে, ৭ পরিচ্ছেদে, তার ইঙ্গিতও দিয়েছেন লেখক:

> শিবনাথের হাঁটতে ভাল লাগছিল এইজন্য যে, কোমল নীলাভ বেশ বড়সড় আকাশের রুপোর পাতের মত এক চিলতে চাঁদ মাথার ওপর অনেকক্ষণ ধরে অনেক দূর এগোবার পরও সে দেখতে পাচ্ছিল। চারতলা ছ'তলার বাধা ছিল না। গাছ এবং ইলেকট্রিকের খুঁচি থাকলেও তারা আকাশ ও চাঁদকে একেবারে ঢেকে রাখতে পারেনি। বরং পাতার ফাঁক দিয়ে, তারের নিচে দিয়ে চাঁদ ও আকাশকে আরো নতুন আরো সুন্দর ঠেকছিল। তারপর অবশ্য আরো বড়, চাঁদ আরো উজ্জ্বল। যেন জলের ওপর চাঁদ ঝুলছে। জ্যোৎস্নার ঝিলমিলে অনেকগুলো রেখা শিবনাথ এক জায়গায় একসঙ্গে দেখতে পেল। সল্টলেক? এই অঞ্চলে শিগগিরি ডেভেলপমেন্ট হবে। এ সম্পর্কে শিবনাথ নিশ্চিত তখন অবশ্য আর লোকে নাক সিঁটকাবে না, নিন্দা করবে না এখানে টিনের ঘরে কেন সে রুচিকে নিয়ে মঞ্জুকে নিয়ে থাকতে এল। ঘরের জায়গার ঘর হয়তো থাকবে,

কিন্তু বারোটা পরিবারের সভ্য সুশ্রী ও সুস্থভাবে বাস করার কত উপযোগী বারোখানা পরিচ্ছন্ন কামরা হবে তখন। ...হয়তো এটাই একটা খুব ফ্যাশনেবল ফ্ল্যাট বাড়িতে পরিণত হবে...

শিবনাথের এই সৌন্দর্যবোধ এবং সৌন্দর্যবোধ সন্নিহিত স্বপ্নবোধ উপন্যাসের পরবর্তী পর্যায়ে আর পরিব্যাপ্ত হয়নি। বরং এই সৌন্দর্যবোধের পরিবর্তে মধ্যবিত্ত স্বভাবজাত অহংসর্বস্ব বিচ্ছিন্নতা বোধ ক্রমশই তাকে ভেতরে - বাইরে গ্রাস করে নিয়েছে। আসলে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালের যে সব স্বভাবগত লক্ষণাদি মধ্যবিত্ত শ্রেণিচৈতন্যে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে শুরু করেছিল, সেইসব লক্ষণাদি নিয়েই মূলত শিবনাথ চরিত্র গঠিত। এইসব লক্ষণাদির মধ্যে ছিল এক ধরণের ইচ্ছাকৃত অকর্মণ্যতা, মানসিক আলস্য, অদ্ভুত কর্ম অনীহাজাত বাউন্ডুলেপনা, দ্বিধাদোলাচলতা, আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিসর্বস্বতা, বিকল সংবেদনশীলতা, সৌন্দর্যপিপাসু মনোবিকল, সুপ্ত অবদমিত যৌন বাসনা, ক্ষয়িষ্ণু পলায়নবাদিতা, আপোষপ্রবণতা ইত্যাদি। যুগাবাহিত এইসব বিভিন্ন লক্ষণাদির প্রায় সবকটাই শিবনাথের মধ্যে খুঁজলে অবশ্যই পাওয়া যাবে। একথা সত্য যে সাধারণত অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার প্রতিকূল প্রেক্ষাপটে প্রথম থেকেই যারা চাকরি পায়নি— তাদের উদ্বেগ বা সমস্যা ছিল কেরকম, কিন্তু চাকরির নিরাপত্তায় থাকতে থাকতে যাদের চাকরি হঠাৎ চলে গেল— তাদের উদ্বেগ বা সমস্যা বাস্তব অর্থে একেবারেই অন্যরকম। আর তাই শিবনাথ যখন চাকরি হারাবার পর মুক্তারামবাবু স্ট্রীট থেকে বারো ঘরের বস্তিতে এসে মাথা গুঁজলো, তখন আমরা ভেবেছিলাম এইবার বুঝি নিরাপত্তাহীন শিবনাথের মধ্যে আর একটা নতুন শিবনাথ জন্ম নিয়ে নতুন করে শুরু করবে তার জীবনের লড়াই। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, বারো ঘরের বস্তি জীবনে আসবার পর, চাকরি না থাকা সত্ত্বেও, শিবনাথের মধ্যে কিন্তু খুব একটা রোজগার - প্রবণতা দেখা যায়নি। এবং উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ অবধি তাকে কেমন যেন দায়হীন, উদ্বেগহীন, একটা আপাত নির্লিপ্ততার আত্মকেন্দ্রিকতাতেই প্রায় সবসময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে দেখি। মধ্যবিত্ত শ্রেণিস্বভাবের এই দায়হীন আত্মকেন্দ্রিকতাকেই কি লেখক জ্যোতিরিন্দ্র বড়ো করে দেখাতে চেয়েছিলেন? মধ্যবিত্ত শ্রেণিস্বভাবের এই জীবিকা-পরাঙ্মুখ দু-চোখ বোজা উদ্যমহীন ব্যক্তিস্বরূপই কি লেখক জ্যোতিরিন্দ্র বড়ো করে ধরতে চেয়েছিলেন? নাকি এভাবেই শিবনাথ তার চাকরি হারানোর আতঙ্ক আপাতভাবে ভুলে থাকবার জন্য নির্বিকার মধ্যবিত্তে ছদ্মবেশী কৌশল সময়ের কাছ থেকেই আয়ত্ত করে নিয়েছে? আসলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শিবনাথের স্ত্রী সুরুচি যদি স্কুল-শিক্ষিকার চাকরি না করতো কিংবা সংসারের দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজের কাঁধে তুলে না নিতো— তাহলে কিন্তু শিবনাথের পক্ষে এমন দায়হীন নির্বিকার স্বভাবের মানসিকতা বজায় রাখা একেবারে অসম্ভবই ছিল। সে জানে বারো ঘর বস্তির অন্যদের মতো তার অবস্থা নয় — কারণ তার স্ত্রী একটা চাকরি আছে। রোজগার যতই সামান্যই হোক না কেন, তিনজনের সংসার খুব ভালোভাবে না হওে চলে তো যাচ্ছে। এই চলে তো যাচ্ছে' ধারণাটা শিবনাথের মধ্যে ভেতরে ভেতরে যত বদ্ধমূল হয়েছে— ততই সে উদ্যোগহীন বা উদ্যমহীন মধ্যবিত্তের ক্ষয়িষ্ণু আলস্যের দিকে হেলে পড়েছে। শুধু তাই নয়— সুরচির চাকরি করাটাই কিন্তু শিবনাথের ক্ষেত্রে কাল হয়েছে। কারণ সুরচি চাকরি করে বলেই একদিকে সে যেমন সংকটের বাস্তব সম্পর্কে খুব একটা ভাবিত হয়নি, অন্যদিকে তেমনই নিজেকে সে সব সময়েই অন্য সব বস্তিবাসী অপেক্ষা স্বতন্ত্র ও উন্নততর ভদ্রলোক মনে করে বারবার অকারণ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে। এর ফলে বারো ঘরের মধ্যে বাস করেও সে বারো ঘরের কেউ নয়, কেউ হয়েও ওঠেনি। এক ধরনের আত্মকেন্দ্রিক অহংসুলভ বিচ্ছিন্নতাবোধ নিয়ে শিবনাথ তাই পারিজাতের বাড়ি যেতে গর্ব ও আগ্রহ দুই-ই বোধ করে, সেক্ষেত্রে বারো ঘরের প্রতিবেশীরা তার কাছে তুচ্ছ— করুণা ও অবজ্ঞার পাত্র। সুরুচির চাকরি না থাকলে তার অব্যবস্থাও যে বারো ঘরের অন্যদের মতোই হতো— এই নিদারুণ সত্যটা কিন্তু সে একবারও তলিয়ে ভাবেনি। কৃত্রিম অহংকারে আচ্ছন্ন এই গা-ঢাকা 'ভদ্রলোক' শিবনাথকে অবলম্বন করে লেখক জ্যোতিরিন্দ্র তাই মধ্যবিত্তের জীবনদর্শন নয়, মুখ্যত দর্শনহীন জীবনেরই কথা বলেছেন। এই জন্যই শিবনাথ চরিত্র আমাদের একইসঙ্গে বিরূপ ও স্তম্ভিত করে। এক্ষেত্রে আলাদা করে কয়েকটি ছোট ছোট ঘটনার কথা বলা দরকার, যার দ্বারা শিবনাথের চারিত্রিক প্রবণতাগুলো কিছুটা হলেও উন্মোচিত হয়ে উঠবে। যেমন:

প্রথমত: শিবনাথ খুব ভালোভাবেই জানে কী অবস্থায় এবং কীভাবে গোটা পরিবার নিয়ে এই বারো ঘর বস্তির মধ্যে এসে তাদের উঠতে হয়েছে। হাতে পয়সা নেই, ঘরেও পয়সা নেই। তা সত্ত্বেও অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে, দুপুরে, সাড়ে ছ-আনা মুদি দোকানদার বনমালীর কাছ থেকে ধার করে সে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে নতুন ডিজাইনের একটা অ্যাশট্রে কিনে নিয়েছে। একথা আমাদের সকলেরই জানা: অ্যাশট্রে কখনোই সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যতালিকার মধ্যে পড়ে না। তবুও শিবনাথ যেভাবে সংসারের চূড়ান্ত দুঃসময়ে অ্যাশট্রেটা কিনেছে — কিনে লজ্জা পাবার পরিবর্তে যেভাবে গর্ব বোধ করেছে— তা থেকে বোঝা যায় তার মানসিকতা। —দ্রষ্টব্য ১০ পরিচ্ছেদে।

দ্বিতীয়ত: শিবনাথ চোখের সামনে দেখছে যাবতীয় অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেও সুরুচি কীভাবে সামান্য মাইনে নিয়ে একা লড়াই করেছে। এক্ষেত্রে শিবনাথের যেভাবে পাশে দাঁড়ানো উচিত, সেভাবে সে মোটেই দাঁড়ায়নি। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সে। বিধু মাস্টারের মতো প্রাইভেট টিউশান স্বচ্ছন্দেই সে করতে পারতো। তাতে সুরুচির বোঝা এবং একইসঙ্গে সংসারের বোঝাও কিছুটা হলে হাল্‌কা হতো। কিন্তু শিবনাথ তা করবে না। উল্টে সুরুচিকে সে অত্যন্ত ঘৃণাভরেই বলেছে— ''প্রাইভেট টুইশানি করা ছোটলোকের কাজ।

দেখতে পাওনা বিধু মাস্টারকে। কী বা পোশাক, কী বা চেহারা। মাস্টারগুলোকে দেখলে আমার ঘেন্না করে।" দুঃখে, দুর্দিনে, দুঃসময়ে, মানুষকে অনেক সময়ে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনেক কাজ করতে হয়। শিবনাথ বাস্তব ও সংসারের সেই সুগভীর প্রয়োজনবাদকে আদৌ বোঝে না। —দ্রষ্টব্য ১৩ পরিচ্ছেদ।

তৃতীয়ত: বাস্তব অবস্থা এবং বাস্তব অবস্থান সম্পর্কে প্রত্যেক মানুষেরই সতর্ক ও সচেতন থাকা উচিত। শিবনাথের মধ্যে সেই সচেতনতা আদৌ ছিল না। তাই পাঁচু ভাদুড়ীর সেলুনে ধারে চুল দাড়ি শেভ করতে যেমন তার কুণ্ঠা থাকে না, তেমনই রমেশের দোকানে ধারে চা খেতেও তার কোনো দ্বিধা নেই। আবার নিজের নেই, তা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আত্মঅহংবোধ অব্যাহত রাখতে কে. গুপ্তকেও মাঝে মাঝে এক আনা দু আনা সে ভাবনা চিন্তা না করেই দান করে বসে। এমনই বিচিত্র এবং এমনই অদ্ভুত শিবনাথ। এমনকি প্রয়োজনে মিথ্যে কথা বলতেও যে তার কোনো দ্বিধা বা জড়তা নেই, তাও বোঝা যয় যখন সে কলকাতায় গিয়ে ব্যবসায়ী বন্ধু মোহিতের সঙ্গে দেখা করে সুরুচির 'বিকলাই ইনফেকশন' হয়েছে বলে পঞ্চাশ টাকা ধার করে আনে। ফেরার সময়, বাসের আয়নায়, নিজের মসৃণ পরিচ্ছন্ন মুমণ্ডল দেখতে দেখতে তবু ও তার মনে হয়— ''কত অভিজাত, কত ভদ্র এই চেহারা।" ভাবা যায় এই আত্মপ্রতারণা?— দ্রষ্টব্য ১৫ পরিচ্ছেদ।

চতুর্থত: সুরুচি যেখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারাদিন একটানা পরিশ্রম করে সন্ধেবেলা বস্তির নিরানন্দ কর্দমাক্ত পাঁকে প্রবেশ করছে, শিবনাথ সেখানে একা একা অদ্ভুত এক আকর্ষণে কলকাতায় এসে দিব্যি ফুরফুরে মেজারে লাইট হাউসে ইংরেজি ছবি দেখতে একটুকু লজ্জা বোধ করে না। এই আত্মসুখ সংগ্রহের স্বার্থপরতা শিবনাথের ভেতরের অন্দরমহলটাকে একেবারে স্পষ্ট করে দেয়। —এতেই ব্যাপারটা শেষ হয় না। এরপরে সে নিজেকে এতটুকু বঞ্চিত না করে ভালো একটা দোকানে চা খায়। তারপর লাইটহাউসের পাশে একটা দোকানে গিয়ে দামি পিতলের ফ্ল্যাওয়ার ভাস দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে যায়। পকেটে আরও দু-একটা টাকা অতিরিক্ত থাকলে সে এই ফ্লাওয়ার ভাসটা যে কিনে নিতোই — এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। সত্যি বলতে ফ্লাওয়ার ভাসটা কি আদৌ মানানসই হতো? শিবনাথের প্রাত্যহিক জীবন ও যাপনের যথার্থ পরিচয় কি এর দ্বারা আদৌ প্রতিফলিত হতো? শিবনাথ যে নিজের অবস্থানগত সত্য সম্বন্ধে একেবারে সচেতন নয়, এই ঘটনাটি তার স্পষ্ট উদাহরণ— দ্রষ্টব্য ২৮ পরিচ্ছেদে।

পঞ্চমত: মায়ের জ্বর হয়েছে বলে বেবি সুরুচিকে তাদের ঘরে নিয়ে যেতে এলে শিবনাথ বাধা দেয়। কারণ সে চায় না সুরুচি গুপ্ত ফ্যামিলির সঙ্গে বেশি মেশামেশি করুক। উপন্যাসের আখ্যান থেকে ইতিমধ্যেই আমাদের জানা হয়ে গেছে যে শিবনাথ রুণুর অ্যাকসিডেন্টের ঘটনায় সম্পূর্ণতই পারিজাতের পক্ষে। সুতরাং এই সময় সুরুচির সঙ্গে গুপ্ত ফ্যামিলির কোনোরকম অন্তরঙ্গতা তৈরি হলে প্রকারান্তরে তা শিবনাথের ব্যক্তিগত স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। রমেশের মৃত্যুর পর শিবনাথের সামনে একটা অভাবনীয় সুযোগ হঠাৎই এসে গেছে। রমেশ ছিল পারিজাতের বহু অবৈধ কর্মের বাইরের কারিগর। শিবনাথ রমেশের সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে উদগ্রীব বলেই সুরুচির হাত টেনে ধরে বলে — ''ও ঘরে তুমি যেতে পারবে না।" সুরুচি হাত ছাড়ানোর জন্য ঝটকা মারতেই কাচের গ্লাসটা মাটিতে উল্টে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। গ্লালটা ভেঙে যেতে সুরচি স্বাভাবিকভাবেই দুঃখ পায়। কারণ গ্লাসটার দাম কম করে ছ-আনা। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যা অনেক। কিন্তু শিবনাথ? এক্ষেত্রে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। বরং ঠোঁট উল্টে সে বলে — ''ভারি তো একটা কাচের গ্লাস।" এই মন্তব্যই অনেক কিছু একসঙ্গে বুঝিয়ে দেয় আমাদের। —দ্রষ্টব্য ৩২ পরিচ্ছেদে।

এই ছোটো ছোটো ঘটনাগুলোর চকিত প্রেক্ষিত থেকে শিবনাথকে দেখতে দেখতে আমরা সহজেই কিন্তু বলে উঠতে পারি —'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।' আমরা সহজেই কিন্তু বলে উঠতে পারি — 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ।' উপন্যাসের সমগ্র আখ্যানে শিবনাথ তাই কোনোভাবেই আমাদের মন ও মানসিকতাকে একটুকু উন্নত করে না, এতটুকু সমৃদ্ধও করে না। তাকে কেন্দ্র করে কোথাও আমরা এতটুকুও দাঁড়াবার জায়গা পাই না। উপন্যসের সমগ্র আখ্যান বিশ্লেষন করে আমরা আসলে দুটো শিবনাথের দেখা পাবো। একজন বাইরের শিবনাথ এবং আর একজন অবশ্যই ভেতরের। বাইরের শিবনাথ শিক্ষিত, সুযোগসন্ধানী এবং অকান্তভাবেই আত্মসুখ অভিলাষী। ট্যাংরা কুলিয়ার বারো ঘরের বস্তি মশা মাছি ও নর্দমা যথেষ্টই নোংরা — এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই, দ্বিমত থাকারও কোনো কারণ নেই। কিন্তু ভেতরের শিবনাথ কি এই বস্তির থেকেও বেশি নোংরা মানসিকতার পরিচয় নানা ক্ষেত্রে দেয়নি? অবশ্যই দিয়েছে। উপন্যাসের আখ্যানে সে যত বেশি করে পারিজাতের দিকে হেলে পড়েছে, ততই কিন্তু সে নিজেকে ক্রমশই ছোটো করে এনেছে, নীচু করে এনেছে। এই নীচুতা থেকেই ২৮ পরিচ্ছেদে শিবনাথের ভেতরের কথাগুলো দ্রুত বাইরে বার হয়ে এসেছে।— ''পারিজাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার একটা মূল্য আছে বৈকি।" এই জন্যেই সমগ্র উপন্যাসের কোথাও তাকে আমরা আমি-র ছোটো পিঞ্জর থেকে কখনোই বার হয়ে আসতে দেখি না। যে নৈতিক দর্শন মানুষকে লড়াইয়ের দিকে নিয়ে যায়, প্রতিবাদের দিকে নিয়ে যায় উত্তরণের দিকে নিয়ে যায়— শিবনাথের ভেতর তেমন নৈতিক দর্শন আদৌ কি ছিল? বলা যায় : ছিল না। আর এ সত্য লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নিজেও ভালোকরেই জানতেন। সে - সত্য

স্বীকার করে নিয়ে 'আমরা সাহিত্যজীবন' গদ্যে তিনি তাই বলেছিলেন :

> 'বারো ঘর এক উঠোন' নিয়েও আমাকে নানা মহল থেকে কম আক্রমণ করা হয়নি। বিদগ্ধ পাঠকদের মধ্যেও কেউ কেউ এই উপন্যাসের নিন্দায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য অনেকটা এইরকম...তিনি শুধু অন্ধকারই দেখেছেন। নিজে যেমন আলো দেখতে পাননি, তেমনি তাঁর এতগুলি চরিত্রের মধ্যে একটিকেও তিনি আলোর পথে উত্তরণের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন না। এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে।... আমি স্বীকার করছি আলো দেখাবার জন্য উত্তরণ দেখাবার জন্য আমি এ বই লিখি নি। কেননা আমার দেখা ও জানা চরিত্রগুলির মধ্যে এমন একটি মানুষও ছিল না, যে এদের মধ্যে উপস্থিত থেকে মহৎ জীবনদর্শনের বাণী শোনাতে পারত। বিপন্ন বিপর্যস্ত অবক্ষয়ি সমাজের মানুষগুলি শুধু বেঁচে থাকার জন্য, কোনোরকমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কতটা অন্ধকারে কতটা নিচে নেমে যেতে পারে আমি তাই দেখিয়েছি। আলো বা উত্তরণের পথে এদের নিয়ে যেতে হলে আমাকে আর এক ভল্যুম বারো ঘর লিখে যেতে হত। কেননা আমি যে সব চরিত্র দেখেছিলাম, তারা জীবিকার অন্বেষণ, খাওয়া, ঘুম মৈথুন সন্তান উৎপাদন ও পরস্ত্রীর দিকে কামার্ত চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করত না, এর অতিরিক্ত কোনো দিনই তারা কিছু করে না...

এ স্বীকারোক্তি দিতে দিতে, অদ্ভুত ব্যাপার, লেখক জ্যোতিরিন্দ্র কিন্তু শিবনাথ ও সুরুচিকে এইসব গতানুগতিক মানুষস্রোতের বাইরেই রেখেছেন। শিবনাথ ও সুরুচি, তাঁর মতে, ব্যতিক্রম। এমন একটা বিশ্বাস্য মত স্থাপন করেই এই গদ্যে তিনি বলেছেন —''তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রম যে না ছিল এমন নয়। যেমন রুচি ও শিবনাথ তারা নিজেদের অন্ধকারে তলিয়ে যেতে দেবে কেন। চিরকালের মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী মানুষদের মতন আলোর দিকে হাত বাড়াবার সুবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা তাদের ছিল।'' কিন্তু সত্যিই কি তাই? লেখক জ্যোতিরিন্দ্রের এই বিশ্বাস্য মতস্থাপনের কোনো শ্রমনিপুণ প্রতিফলন কোথাও কিন্তু দেখা যায় না। বলতে দ্বিধা নেই: শিবনাথের মধ্যে যদি কোনোরকম মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধি ও বিচক্ষণতা থেকে থাকে, তার সবটাই কিন্তু সে জলাঞ্জলি দিয়েছে আপোষপ্রবণতার পদপ্রান্তে। লেখক জ্যোতিরিন্দ্র গতানুগতিক মানুষদের কামার্ত দৃষ্টির সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে যথারীতি বিস্মৃত হয়েছেন। অথচ উপন্যাসে শিবনাথের যৌনপ্রবণ আসক্তির উদাহরণও কিন্তু কম নেই। উদাহরণও দেওয়া যায়। যেমন পারিজাতের বাড়ি টিউশানের জন্য শিবনাথ যে ক-বার গেছে —তাকি শুধু টিউশান প্রার্থনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? মোটেই নয়। বরং পারিজাতের স্ত্রী দীপ্তির স্বাস্থ্য, শ্রী ও উচ্ছলতার প্রতি ভেতরে ভেতরে তার একটা সুপ্ত যৌন আকর্ষণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ২১ পরিচ্ছেদে আমরা শিবনাথের ভাবনাক্রমে তার প্রতিচ্ছবি ও প্রতিফলন দুইই পেয়ে যাই। এখানে ঘুমহীন শিবনাথ অন্ধকার ঘরে পায়চারি করতে করতে বৃষ্টিভেজা টাটকা কদমের গন্ধ পাচ্ছিল। আর সেই গন্ধের মধ্যেই কল্পনায় এসে দাঁড়াচ্ছিল দীপ্তি রায়ের গয়ের মধ্যেও এই গন্ধ এসে বাসা বেঁধেছে।'' ২১ পরিচ্ছেদে শিবনাথের ওই প্রবল ঘ্রাণশক্তির মধ্যে যৌনবোধ কিছুটা হলেও হয়তো উহ্য ছিল, কিন্তু ২৭ পরিচ্ছেদে ঘ্রাণ যেই দর্শনে পৌঁছে গেল— তখন উহ্য আর উহ্য হইলো না। — সম্পূর্ণতই উন্মোচিত হয়ে পড়লো। এই পরিচ্ছেদে অন্ধকার আড়ালে দাঁড়িয়ে শিবনাথ আঠারো বসন্তঘেরা কুমারী বীথির নগ্ন স্তন দেখে ভেতরে ভেতরে যথেষ্টই অক্রান্ত হয়েছিল। লেখক লিখেছেন — ''জীবনে, এই অভিজ্ঞতা নতুন না হলেও শিবনাথ আর একবার তার স্বাদ অনুভব করে রোমাঞ্চিত হয়। এবং অন্ধকারে অনেকক্ষণ ঘুমোতে চেষ্টা করেও যখন ঘুমের পরিবর্তে বীথির নগ্ন সুডোল কুমারী বুকের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল, তখন অতি সন্তর্পণে সেই অদ্ভুত জ্বলন্ত নেশা ভুলতে ভয়ে ভয়ে নিজের হাতখানা বাড়িয়ে রুচির (তখন মৃতপ্রায় বলা চলে) এখানে ওখানে একটু আধটু হাড় বের হওয়া কোমরের এপর সেটা রাখল...।'' এই জ্বলন্ত নেশাটা যে কি তা বুঝতে খুব অসুবিধা হবার কথা নয়। সুতরাং লেখক জ্যোতিরিন্দ্র যতই শিবনাথকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর রূপকল্পে স্থাপন করুন না কেন। — যতই তাকে আলাদা ও ব্যতিক্রমে ভাবতে থাকুন না কেন— আখ্যানের এই শিবনাথ আসলে ক্রমশই তার মূল্যবোধ স্থান মানসিক অবক্ষয় নিয়ে নির্লজ্জভাবেই কিন্তু আপোষপ্রবণতার দিকেই চলে গেছে। বলতে দ্বিধা নেই : এই আপোষপ্রবণতার একদিকে রয়েছে বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালের মেরুদণ্ডহীন মধ্যবিত্তের আত্মপ্রবঞ্চনা, অন্যদিকে রয়েছে দেশভাগ পরবর্তী স্বাধীনতা-উত্তর নপুংসকের সামাজিক অধঃপাতের করুণ ইতিহাস। তহালে কি চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকট থেকেই মানুষের আত্মিক পতন শুরু হয়ে যায়? তাহলে কি চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সংকটই মানুষকে ঠেলে দিতে থাকে বাহিরের ও ভেতরের এক ক্রম অবক্ষয়ী আপোষপ্রবণতার দিকে? এই প্রশ্নের উত্তর অন্তত বেশ কিছুটা শিবনাথে আছে, বারো ঘর এক উঠোনে আছে, সন্দেহ নেই।

তিন

আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজের সবচেয়ে বড়ো মর্মব্যাধি সম্ভবত তার আপোষপ্রবণতা। আসলে যখন অন্তর্লোক থেকে অন্তর্জিজ্ঞাসা সরে যায়, মানুষ তখন আর কিছুতেই ঘরের এবং বাইরের সামগ্রিক বিনষ্টিকে আপন মনোধর্মের তীক্ষ্ণতা দিয়ে যাচাই করতে পারে না। সবচেয়ে বড়ো কথা : যাচাই করবে কি করে? মনোধর্মের তীক্ষ্ণতাও তো তখন অপহৃত হয়ে গেছে। হতাশা, সংশয়, অবিশ্বাস, স্বপ্নভঙ্গ — এসব মিলেমিশে এমন এক নেতিবাচক অস্তিত্ব ও অবস্থান তখন

তৈরি হয়ে যায়, যা থেকে বার হয়ে আসাটাও অত্যন্ত কঠিন। 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে এমনই অন্তর্জিজ্ঞাসাহীন পরিব্যাপ্ত বন্দিশালা রয়েছে — কিন্তু সে বন্দিশালা থেকে বার হয়ে আসার পথ ও পরিক্রমা নেই কোথাও। জীবনের ভাঁজে ভাঁজে তাই তীক্ষ্ণতার অভাবে, ইচ্ছাশক্তির অভাবে, এমনকি অন্তর্জিজ্ঞাসার অভাবে, ময়লা জমেছে, ক্রমাগত ময়লা জমেছে। এই স্তরীভূত ময়লাই আসলে অপোষপ্রবণতা। মূল্যবোধের অবক্ষয়ে এই ময়লার মধ্যেই নির্বিবেক আত্মসমর্পণ করেছে কে. গুপ্ত অমল চাকলাদার কিংবা বিধূ মাস্টারের মতো পুরুষেরা। আবার পুরুষদের এ-হেন বিবেচনাহীন বিনষ্টির ভয়াবহ আঘাত সামলাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এই ময়লার মধ্যেই এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে প্রীতি বীথি কিরণ সুরুচির মতো নারীরা। ফলে সর্বত্রই শুধু আপোষ আর আপোষ। এক্ষেত্রে সবাইকে কিন্তু ছাপিয়ে গেছে শিবনাথ একাই। কয়েকটি ঘঠনার উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্টতা পাবে। যেমন:

১. পারিজাতের গাড়িতে রণুর অ্যাকসিডেন্ট হবার পর গোটা ব্যাপারটাকে রমেশ ধূর্ততার সঙ্গে অন্যদিকে চালান করে দেয়। মুখ্যত সে-ই চারিদিকে ছড়িয়ে দেয় নানারকমের বিভ্রান্তিকর সংবাদ। তার বক্তব্য অনুসারেই বারো ঘর বস্তি জানলো— রুণু একদল দুষ্কৃতীসহ পরিজাতের গাড়ি আক্রমণ করেছিল। এটা সম্পুর্ণই পলিটিক্যাল আক্রমণ। আর তাকে পারিজাত চাপা দেননি। কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে তিনি তিনদিন ধরে ঘর থেকে তো বার হয়নি। এভাবেই সত্যিটা মিথ্যে হয়ে গেলো, নিথ্যেটা সত্যি। উদভ্রান্ত কে. গুপ্ত রাস্তায় শিবনাথকে আঁকড়ে ধরে জিজ্ঞাসা করেন —''আচ্ছা আপনি কি জানেন, সন্ধ্যার পর পারিজাত বাড়িতে ছিল না গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল? কারেকট ইনফরমেশন দিতে পারেন?" শিবনাথ কিন্তু সব জেনে শুনেও 'কারেকট ইনফরমেশন দেবার পরিবর্তে শুধু নির্লিপ্ত উত্তর দিয়ে বলেছে— ''আমি কি করে বলব? আমি তো এইমাত্র বাজার সেরে ফিরলাম।' —দ্রষ্টব্য ২৬ পরিচ্ছেদে।

২. শেখর ডাক্তারকে উগ্র লম্পট সুবীর ঘোষ শিবনাথের সামনেই শাসিয়ে যায়— সুনীতিকে না পেলে সে শেখর ডাক্তারের মুণ্ডু দু-ফাঁক করে দেবে। ভীত, সন্ত্রস্ত এবং অসহায় শেখর ডাক্তার শিবনাথকে সাক্ষী মেনে অনুরোধ করে বলে — ''দরকার হলে আপনি উইটনেস হবেন। থানার লোক যদি এসে জিজ্ঞাসা করে ...আমি আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে বলব এঁকে প্রশ্ন করুন। সুতরাং এখন আমাকে সেভ করুন স্যার।" শেখর ডাক্তারের এই কাতর আর্তনাদ ও সনির্বন্ধ অনুরোধ কিন্তু শিবনাথকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না। উল্টে সে শেখর ডাক্তারকে রীতিমত ঠেলে সরিয়ে বাইরে বার হয়ে এসে স্বগতোক্তি করেছে— ''যত সব মাথাখারাপ।" শিবনাথ আপোষপ্রবণ বলেই এইসব বাইরের অনাবশ্যক ঝুট ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়তে চায় না। সে মনে করে —''থানা আর পুলিশ। আসামী। সাক্ষী। অর্থাৎ আর একটি দুশ্চিন্তা।"—দ্রষ্টব্য ২৯ পরিচ্ছেদ।

৩. বিপদে পড়ে বেবি যখন সুরুচির কাছে এসেছে, শিবনাথ তখন তাকে দেখে এতটুকু খুশি হয়নি। বরং একইসঙ্গে বিব্রত ও বিরক্ত হয়েছে। বেবি চলে যাবার পর শিবনাথ যেভাবে রমেশের মিথ্যা প্রচারটাকেই সক্রিয়ভাবে সুরুচির মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে বিভ্রম তৈরি করবার চেষ্টা করেছে, তা থেকেই বোঝা যায় : এই শিবনাথ নিজেও এক অর্থে বিভ্রান্ত বাস্তবতার শিকার এবং শরিক। সুরুচিকে আটকাবার নানাবিধ চেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, তখন শিবনাথের ভেতরের সংকীর্ণ স্বার্থপর সত্তাটা নিরুপায় আক্রোশে বলে উঠেছে — ''কাল আমাদের ঘরে পুলিশ আসবে। তোমার কি, তুমি কমলাক্ষ্মী গার্লস স্কুলের টিচারি করছ, বড় সার্টিফিকেট। মুশকিল বাধবে আমাকে নিয়ে।" শিবনাথের এই অদ্ভুত নিষ্ক্রিয়তা, মধ্যবিত্তের এই কামুকরূপ, বোঝামাত্র সুরুচি তাকে 'কাপুরুষ' বলে ধিক্কার জানিয়ে দ্রুত পায়েই এগিয়ে গেছে বেবিদের ঘরের দিকে। —দ্রষ্টব্য ৩২ পরিচ্ছেদ।

৪. কে. গুপ্তর স্ত্রী সুপ্রভা আত্মহত্যা করবার আগে একটা সুইসাইড নোট রেখে যায়। —''আমার রুণুর কোনো দোষ ছিল না। পারিজাত ওকে গাড়ি চাপা দিয়ে জন্মের মতো পঙ্গু করে দিলে অথচ তার কোনো প্রতিকার হল না। এমনকি ঘটনাটা যাতে প্রকাশ না পায় তার চেষ্টার ত্রুটি দেখছি না।" শিবনাথ দুবলাকে ঘষা দু-আনি ঘুষ দিয়ে চিঠিটা পারিজাতকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সরিয়ে ফেলেছে। তারপর যেন একটা বিরাট মহৎ কাজ করে ফেলেছে এ-রকম চাপা আনন্দ নিয়ে পৌঁছে গেছে পারিজাতের বাড়ি। — দ্রষ্টব্য ৪৩ পরিচ্ছেদ

৫. পারিজাত ও শশাঙ্ক বাগচী মদ্যপানরত। সুইসাইড নোটটা নিয়ে সেখানে শিবনাথও উপস্থিত। ইতিমধ্যে পারিজাতের বৌ দীপ্তি তার কাঙ্ক্ষিত প্রেমিক মন্টুর কাছে চলে গিয়েছে। স্ত্রী-মুক্ত পারিজাত শশাঙ্কের সামনেই শিবনাথের স্ত্রী সুরুচির নির্লজ্জ প্রশস্তি শুরু করে দেয়। শুধু তাই নয়— দীপ্তিকে সে চিঠিতে কী লিখেছে তারও বিকৃত বিবরণ শোনা যায় তার কণ্ঠে। —''আমিও এখানে কিছু দুঃখে নেই। বরং ভালই আছি। স্কুলটিচার বস্তিতে থাকে বটে কিন্তু মেয়েটি দেখতে ভাল, বুদ্ধিমতী। আমি তার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলছি।' বলতে বলতে পারিজাত হি হি করে কুৎসিত হাসি হাসে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ-সব কথা শুনেও শিবনাথের কোনোরকম ভাববিকার হয় না। এক্ষেত্রেও সে নিরুত্তাপ, নিরুত্তেজ, প্রতিবাদহীন।

বরং স্ত্রীর অপমান সচ্ছন্দে গায়ে মেখে নিয়ে সে পারিজাতের কাছ থেকে দু-হাজার টাকার চেক পেয়েই যথাসম্ভব খুশি। —দ্রষ্টব্য ৪৩ পরিচ্ছেদ

৬. পারিজাতের ইলেকশানকেন্দ্রিক রাজনৈতিক কাজকর্ম সেরে অনেক রাতে শিবনাথ বাড়ি ফিরছে। অন্ধকারে রাস্তা জুড়ে প্রায় উন্মাদের মতো দাঁড়িয়ে কে. গুপ্ত। সে শুধু একটা চমৎকার খবর শিবনাথের কানে ঢেলে দিতে চায়। চমৎকার খবরটা কি? ফিল্ম মেকার চারু রায় এসেছিল সুরুচির কাছে। টিনের ফুটো দিয়ে কে. গুপ্ত, প্রবল কৌতূহলে, দেখেছে— ''দ্যাট বাগার, হুঁ চারু — হি কিস্‌ড রাইট অন হার।'' আর একইসঙ্গে ''দেবি দেবি বলে হঠাৎ গদগদ সুরে মন্ত্র পাঠ করছে।'' এই রুদ্ধশ্বাস বিবরণ শুনতে শুনতে শিবনাথ ঢোঁক গিলেছে, জুতো হাতে তুলে নিয়েছে, শক্ত হাতে কে. গুপ্তর গলা টিপে ধরেছে, সাপের মতো হিসহিস শব্দও করেছে। কিন্তু তারপর? হ্যারিকেন হাতে সুরুচি যেই বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে, মুহূর্তে শিবনাথ ঢুকে পড়েছে তার মধ্যবিত্ত আপোষপ্রবণ খোলসের ভেতর। অনেকটা যেন জোঁকের ওপর নুন পড়বার মতো অবস্থা। আর কোনো উত্তেজনা নেই, আর কোনা চাঞ্চল্য নেই, আর কোনো প্রশ্ন উত্থাপন নেই। দ্রুত গোটা অবস্থা ও পরিবেশটাকে স্বাভাবিক করে নেয় সে। এমনকি চারু রায় তার জন্য একটি টিন সিগারেট রেখে গেছে শুনে প্রবল উচ্ছ্বাসে বরো ঘরের উঠোন কাঁপিয়ে হেসে উঠতেও সে বিন্দুমাত্র দেরি করেনি। তারপর সুরুচির হাত ধরে যথারীতি ঘরে ঢুকে গেছে অতিরিক্ত নির্বিবেকী ভাসমানতায়। এক টিন সিগারেটের সামনে শুধু ঝুলে থাকে একটা বিরাট প্রশ্নচিহ্ন? —দ্রষ্টব্য ৪৩ পরিচ্ছেদ।

এইসব ছোটো ছোটো জীবনযন্ত্রণার কামড় সমস্ত উপন্যাসে ছড়ানো থাকলেও এই জীবনযন্ত্রণাকে অঙ্গীভূত করে শিবনাথ আত্মসমীক্ষাতেও রত হয়নি, আবার আত্ম প্রসারণেও পৌঁছতে পারেনি। ফলে একসময় মধ্যবিত্তর আপোষপ্রবণতার মধ্যেই তার এক অদ্ভুত ভরাডুবি ঘটে যায় এবং সব চেয়ে বড়ো কথা ভাসমান অবস্থায় এই ভরাডুবিকে সে মেনেও নেয় আপাত এক দুর্বোধ্য স্বাভাবিকতা প্রাণপণে বজায় রেখেই। শুধু শিবনাথ কেন, কম-বেশি উপন্যাসের পুরুষ ও নারী, প্রায় সব চরিত্রের ক্ষেত্রেই এই বাধ্য নিরুপায় ভাসমান ভ্রান্তি ভ্রমণের লক্ষ্যহীন ভরাডুবি দেখাবেন বলেই কি লেখক জ্যোতিরিন্দ্র উপন্যাসে একটা বারো কেবিন বিশিষ্ট জাহাজের প্রতীকী দৃশ্য সংযোজন করেছেন? মনে হয় তাই। —''অন্ধকার আকাশের নীচে সাঁতার কেটে চলেছে জাহাজটা।'' কোথায় যাচ্ছে? কেউ জানেনা। কেন যাচ্ছে। কেউ জানেনা। শুধু ভাসমান, শুধু ভাসমান। যে কোনো সময় তার ভরাডুবি ঘটে যেতে পারে। মধ্যবিত্ত পতনবিশ্বের এমন সমূহ সর্বনাশের ইঙ্গিতই বলে দিচ্ছে প্রতিটি চরিত্র কতখানি বিপন্ন কিংবা বারো ঘর কতখানি বিপন্ন। মনে রাখা দরকার, মূলত এই বিপন্নতার তল পর্যন্ত পৌঁছবেন বলেই লেখক জ্যোতিরিন্দ্র সপরিবারে বস্তিতে গিয়ে উঠেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী পারুল নন্দী তাঁর স্মৃতিচারণামূলক গদ্যে বলেছেন:

> মেয়ে তাতে তখন বছর চারেকের।...সে সময় বেলেঘাটার বারোয়ারিতলায় একটা বস্তি দেখে এসে আমাকে বললেন—'ঐ বস্তিতে থাকতে হবে লেখার প্রয়োজনে।' আমি সম্মতি জানালাম। লেখার তাগিদে ঐ বেলেঘাটায় তের বস্তির মধ্যে আমরা ছিলাম। উনি তেরঘর নাম না দিয়ে রাখলেন 'বারো ঘর এক উঠোন'...

তেরো ঘর বারো ঘর হয়ে গেলো। বারো ঘর বারো কেবিন হয়ে গেলো। বারো কেবিন একটা সম্পূর্ণ ভাসমান জাহাজ হয়ে গেলো। তারপর থেকেই শুধু অপেক্ষা : ভরাডুবি হবে কি হবে না। লেখক জ্যোতিরিন্দ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন। প্রশ্ন ওঠে: তাহলে কি এই বিপন্নতা ও ভরাডুবির কাছ থেকে সাময়িক উদ্ধারের আশ্রয় পাথেয় হিসেবেই এসেছে শিবনাথ ও অন্যদের আপোষপ্রবণতা? নাকি শিবনাথের মতো পুরুষদের আপোষপ্রবণতাকে সামনে রেখে লেখক জ্যোতিরিন্দ্র দেখালেন হালভাঙা অর্থনীতি মানুষের মেরুদণ্ডটাকে কতখানি নুইয়ে দিতে পারে, তারি পঙ্কিল ইতিহাস? আসলে লেখক জ্যোতিরিন্দ্র, এই উপন্যাসে, মধ্যবিত্ত স্বভাবধর্মের চোরা তরঙ্গগুলোকে ক্রমশ এক Mirror Realism বা মুকুরধর্মী বাস্তবতার ভেতর সনাক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। এই মুকুরধর্মী বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে অধঃপতনের একটা পর একটা খাঁচা সর্বজনসমক্ষে দ্রুত খুলে যাচ্ছে। সব খাঁচার মধ্যেই শুধু পড়ে আছে ভ্রান্ত সব রাস্তা। একসময় এই ভ্রান্ত রাস্তাতেই একের পর এক মেয়েরাও পা রেখেছে। রক্ষণশীলতার দুর্গ ভেঙে, সন্দেহ চোরা চাহনি আর পর্যায়ক্রমিক কটূক্তি ক্রমাগত সহ্য করে, সংসারে গর্ত বোজাতে এভাবে অন্তঃপুর ছেড়ে বার হয়ে আসাটাও তো এক ঐতিহাসিক সত্য। এই সত্যকেও লেখক জ্যোতিরিন্দ্র মধ্যবিত্তের নঙর্থক আপোষপ্রবণতরার সামনে এনে দাঁড়া করিয়েছেন। ২৭ পরিচ্ছেদে বিধু মাস্টার তাই দুই মেয়েকে যে কথা বলেছে, একবার তা স্মরণ করা যেতে পারে:

> যদি ঘরে কিছু আসে, যদি বুড়ো বাপ-মাকে দুটি খেতে দিতে পারে এদিনে তো সে ছেলেরা নয়, মেয়েরা। এটা মেয়ের যুগ। এখন আর এত মান সম্মান লাজলজ্জা নিয়ে বসে থাকলে চলে না। কারোর মেয়েই থাকতে পারছে না। কাজ করতে হবে, যদ্দিন বিয়ে না হচ্ছে। গৌরিদানের যুগ চলে গেছে...

সত্যি বলতে বিধু মাস্টারের এই বক্তব্যই (...এটা মেয়ের যুগ...) উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বক্তব্য হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু আদৌ তা হলো কি? বেবি, প্রীতি, বীথির মতো অনেক মেয়েরাই রূঢ় কঠিন বাস্তবের নির্দেশে বাইরে এলো বটে, কিন্তু এসে যতখানি সমকালের দাবির কাছে উন্মুক্ত হলো — তার বিনিময়ে তারা কি পেলো? কোথায় পৌঁছলো? কোথাও

না। বরং স্খলনের দা পড়লো, পতনের ছাপ পড়লো, ভেতরে - বাইরে। 'মেয়ের যুগ' বাইরে বার হয়ে আসা সত্ত্বেও কোথাও কিন্তু দৃঢ়মূলে তৃণমূলে প্রতিষ্ঠিত হলো না। লেখক জ্যোতিরিন্দ্র এই উপন্যাসে 'বধূরূপে' নারীদের (যেমন — লক্ষ্মীমণি, কিরণ, দীপ্তি, সুরুচি, মল্লিকা, যশোদা প্রমুখ) এনেছেন। 'কন্যারূপে' নারীদের (যেমন — সুপ্রভা, প্রভাতকণা, ভুবন-গিন্নি প্রমুখ) এনেছেন। একটা উপন্যাসে এত নারী বহুরূপে থাকা সত্ত্বেও দেখা গেল : মূল্যবোধহীনতার গহ্বরে তাদেরও ভরাডুবি ঘটে গেছে। নষ্টভ্রষ্ট এবং লক্ষ্যহীন তারাও। সুতরাং 'বারো ঘর এক উঠোন' অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে একটা অন্তর্সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তা হলো— এখানে পুরুষ চরিত্রেরাও কোথাও পৌঁছোয়নি, নারীচরিত্রেরাও কোথাও পৌঁছুতে পারেনি। এই ব্যর্থতার মূল কারণ কি? অন্তর্নিহিত কারণ বলা যায় একটাই। আত্মসমীক্ষা ও আত্মবিশ্লেষণ ছাড়া কোনো মানুষের পক্ষেই কখনো কোথাও পৌঁছোনো সম্ভব নয়। আর এই দুইয়ের সংমিশ্রিত বা যুধবদ্ধ চৈতন্য - সংক্রমণ না থাকলে কোনো আত্মদর্শনের শক্ত ভিত্তিভূমিও কোনোকালে গড়ে ওঠেনা। উপন্যাস পাঠের পর তাই স্বভাবসঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে : এই উপন্যাসের কোনো চরিত্রের কি চৈতন্য সংক্রমণজাত সেই আত্মদর্শন ছিল? ছিলনা। আর ছিল না বলেই সর্বত্র শুধু আপোষপ্রবণ পুরুষদের এবং বিপথগামিণী নারীদের পতনের শব্দ শোনা গেছে। লেখক জ্যোতিরিন্দ্র অবশ্য এই নেতিসর্বস্ব অবস্থানগত সত্যবিভ্রমের একটা নিজস্ব ভাষ্যও দিয়েছেন। 'কালপুরুষ' পত্রিকার (এপ্রিল সেপ্টেম্বর ১৯৮২) তরফ থেকে সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত যখন তাঁর কাছে এই উদ্যোগহীন আত্মসমর্পণ বিষয়ে প্রশ্ন রাখেন, তখন তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন:

> প্রতিবাদ করা বা লড়াই -এর মনোবৃত্তি নিয়ে যে লেখা তা আমি কোনোদিন করিনি, কাবণ আমার মনে হয়েছে ওটা করতে গেলে সব সময়েই একটা আওয়াজ তুলতে হয় যেখানে এক ধরনের পলিটিক্যাল মোটিভ কাজ করে বলে আমার মনে হয়। আমার বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসের কথা ভাবুন। এর মধ্যে বহু চরিত্র এবং অবক্ষয়ের চিত্র রয়েছে, রয়েছে অধঃপতন। এখানে সুযোগ ছিল প্রতিবাদের, শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদের একটা আওয়াজ তুলতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি এজন্যে যে লোকগুলোই কোনো প্রতিবাদ করে না, ওরা শুধু মেনে নেয়। চরিত্রগুলোকে নিখুঁত ও জীবন্ত করার জন্যই প্রতিবাদের আওয়াজ তুলিনি। ...আমি যদি প্রতিবাদ করতাম তাহলে সেটা আমার কথা হত, ওদের কথা নয়। সেটা করলে আমি নিজেকে আরোপ করতাম, সেটা মোটেই শিল্পসঙ্গত নয়...দ্রষ্টব্য : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা : অনুষ্টুপ : প্রাক শারদীয়া ২০০৯

লেখক জ্যোতিরিন্দ্রেয় এই ভাবনাকে আত্মস্থ করেও বলা যায়— ছোবল দেবার দরকার নেই, কিন্তু ফোঁস করা কি যেতো না? ফলে এই উপন্যাস Mirror Reality-র মুকুরধর্মী বাস্তবতার মধ্যে আবদ্ধ রইল, Critical mirror বা সমালোচনা সম্পৃক্ত বাস্তবধর্মীতার বৃহৎ উন্মোচন পর্যন্ত যেতে পারলো না। একটা বিপ্রতীপ ডিসকোর্স, অনেক সময় তির্যক নৈরাজ্যের বিরুদ্ধেও কিন্তু অনেক কথা বলে যেতে পারে। লেখক জ্যোতিরিন্দ্র অসম্ভব শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও, সেইদিকে, কেন ধ্যান দিলেন না? মধ্যবিত্তের ভ্রান্তি তাই তার অন্তর্জগতেই থেকে গেল— একবারও আগুনে পুড়লো না। উপন্যাস প্রকাশের দু বছর পর, হয়তো এই কারণেই, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার (৪ মাঘ চৈত্র ১৩৬৪) উনিশ সংখ্যায় লেখক কমলকুমার মজুমদার, একটি তীব্র নির্মম সমালোচনা করে বলেছিলেন— এই উপন্যাসের পটভূমিকায় বস্তি আছে, কিন্তু 'বস্তির দৈনন্দিন জীবন' নেই, জীবনের 'ত্রিবিধ দুঃখ' নেই, 'সত্যদর্শন' এইখানে 'বিকলাঙ্গ'। আসলে যে অন্তর্ঘাতী রসায়ন থেকে মানুষ বিষ ও মধুর স্ববিরোধী চৈতন্যের যুগ্মতায় হাহাকার করে, আবার অস্তিত্ব নিঙড়ানো গর্জনও তোলে— কমলকুমার হয়তো এই উপন্যাসে তারই অভাববোধ করেছিলেন। তবু, একথা বলতেই হয়, লেখক জ্যোতিরিন্দ্র এই উপন্যাসে ক্রাইসিস ফ্র্যাস্টেশনের ওপরেই জোর দিয়েছেন বেশি —আর তীব্র দৃষ্টিসম্পন্ন সমাজ বিজ্ঞানীর মতোই ক্রমহ্রাসমান মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে পরিমাপ করেছেন নিম্নগামী মনোবিকলন। সত্যি বলতে কতখানি নামলে আর ওঠা যায় না— আজ পর্যন্ত তার নির্দিষ্ট পরিমাণ জ্ঞান কি আমাদের আছে।